বোকার স্বর্গ

আকাশ মালিক

(প্রকাশিতব্য বইয়ের একটি প্রবন্ধ)

(পর্ব- ৭)

এবার দেখা যাক দ্বিতীয় সুরা। সুরার নাম 'আত-তাওবাহ'। আশ্চর্যজনকভাবে কোরানে 'সুরা আত-তাওবাহ'ই একমাত্র সুরা যার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়া হয় না। কেন হয় না, তা নিয়ে তফসিরকারকদের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্য আছে। আরও আশ্চর্য ব্যাপার হলো, মুহাম্মদ(দঃ) এই সুরা লিখিয়েছিলেন নবম হিজরিতে অর্থাত্ সুরা আনফাল রচনার সাত বত্সর পরে। এই সাত বছরে ধুলিধুসর বালুকাময় মরুভূমিতে আরও অনেক যুদ্ধ হলো, বদরের পরে ওহুদের যুদ্ধে, খন্দকের যুদ্ধে, হুনাইনের যুদ্ধে, মুতা'র যুদ্ধে শতশত মানুষের গলা কাটাকাটি হলো, অনেক অনেক কথা মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর নামে কোরানে লেখালেন, এতো সব বাদ দিয়ে সুরা 'আনফাল'-এর পরপরই সুরা 'আততাওবাহ' আসলো কি করে? কোরানের প্রথম সুরা, 'বাকারা' নয়, সুরা 'ফাতিহা'ও নয়। হাতের কাছে কোরানখানি এমনভাবে উপস্থাপন কারা কিভাবে করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর বোধ করি হজরত উসমানের (রাঃ) কোরান সংকলন কমিটির সেই সদস্যবৃন্দ, যথা জাবিদ বিন থাবিত, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের, সাদ বিন আল-আস, আব্দুর রহমান বিন আল-হারিথ বিন হিশাম ছাড়া আর কেউ জানে না। (দ্রষ্টব্য : বোখারি শরিফ, ভলিউম ৪, বুক ৫৬, নম্বর ৭০৯)। মুহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং কোরান সংকলন করেননি, তাঁর সে সময়ও ছিল না।

এবার মৌলানা আবুল আ'লা মওদুদির তাফহিমুল কোরান (উর্দু ভার্সন) থেকে 'সুরা তাওবাহ'র শানে-নুজুলের সারাংশ :

এই সুরায় বিশেষভাবে 'হুদায়বিয়া সন্ধি' এর পরবর্তী ঘটনাবলীর বিবরণ স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে দুটি প্রধান ঘটনার একটি ছিল কোরায়েশদের সাথে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ, অপরটি রোমানদের সাথে তাবুকের যুদ্ধ। নবীজির (দঃ) হিজরতের পর থেকে 'হুদায়বিয়া সন্ধি'র সময় পর্যন্ত ছয় বত্সর অতিবাহিত হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে মুসলমানগণ আরবের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জয় করে সেখানে এক নতুন সভ্য, শান্তিপূর্ণ, শক্তিশালী সংগঠিত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি নবীজির (দঃ) জন্যে ইসলাম বিস্তারে বর্ধিত সুযোগ এনে দেয়। বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কাছে তাবলীগি দল প্রেরণ করে ইসলাম প্রচারের কাজ

চলতে থাকে। সন্ধির দুই বৎসরের মধ্যে মুসলমানদের শক্তি ও সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পেলো যে মক্কার কোরায়েশগণ ভাবতে লাগলেন, এই সন্ধির মাধ্যমে মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। তারা দুই বৎসরের মাথায় এসে সন্ধি ভঙ্গ করে, সকল শক্তি দিয়ে শেষবারের মতো ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে চাইলেন। কিন্তু আল্লাহর রসুল (দঃ) তাদেরকে সে সুযোগ দিলেন না। কোরায়েশগণ যথেষ্ট শক্তি ও সৈন্য জোগাড় করার আগেই নবীজি (দঃ) অষ্টম হিজরির রমজান মাসে ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে অতর্কিতভাবে মক্কা আক্রমণ করেন। কোরায়েশগণ বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যদিও কাফেরদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, তারপরও মক্কা ও তায়েফের পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশ কয়েকটি গোত্রের বিদ্রোহীগণ সমেবতভাবে, শক্তিশালী ইসলামকে ধ্বংস করার শেষ চেষ্টা করে। তাদের সাথে হুনাইন নামক স্থানে, অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসের ছয় তারিখ (২৭ জানুয়ারি ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে) মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধেও কাফেরগণ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। হুনাইন যুদ্ধে কাফেরদের পরাজয়, সমস্ত আরব বিশ্বকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার পথ সুগম করে দেয়।

'হুদায়বিয়ার সন্ধি' চলাকালীন সময়ে আল্লাহর রসুল (দঃ) ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে আরব দেশের বিভিন্ন এলাকায় দলে দলে লোক পাঠাতে থাকেন। এমনি একটি দল সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে, রোমান বাদশাহর অধীনস্থ খ্রিস্টানবসতি এলাকায় প্রেরণ করা হয়। সেখানকার লোক মুসলমানদের ১৫জন সদস্যকে হত্যা করে ফেলে। আরেকটি দল ইরাকের বসরায় পৌঁছুলে সেখানকার খ্রিস্টান গভর্নর শুরহাবিল বিন আমর, মুসলিম দলের নেতা হরিস বিন্ ওমরকে (যিনি রসুলের) রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলেন) হত্যা করে। আল্লাহর রসুল (দঃ) ভাবলেন, এখনই রোম সাম্রাজ্য-সংলগ্ন এলাকায় মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে নবীজি (দঃ) হিজরি ৮ সালের জমাদি-উল্ উলা মাসে ৩ হাজার সৈন্য সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় প্রেরণ করেন। সুরহাবিল এক লক্ষ সৈন্য তার ভাইয়ের নেতৃত্বে মুতা'র দিকে পাঠিয়েছিলেন। রোমান সৈন্যদল মুতা'য় পৌঁছার আগেই সংবাদ আসলো শুরহাবিল বিন্ আমর মুসলমানদের কাছে পরাজয় বরণ করেছেন। রোম-সম্রাট উপলব্ধি করতে পারলেন রোমসহ সারা আরব বিশ্বই মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। তিনি 'মুতা' যুদ্ধের চরম অসম্মানজনক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পরবর্তী বৎসরেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। আল্লাহর রসুল (দঃ) যিনি প্রতিমুহূর্তের ঘটনাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, রোমান সম্রাটের পরিকল্পনা যথাসময়ে নবীজি টের পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। রসুল (দঃ) প্রবল শক্তিশালী

রোমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁর সৈন্যগণকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। অন্যান্য সময়ে আক্রমণের কৌশল হিসেবে সাধারণত আল্লাহর রসুল (দঃ) কার ওপর, কোথায়, কখন, আক্রমণ করা হবে তা প্রকাশ করতেন না, এমন কি মদিনা ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও তা গোপন রাখতেন। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি রোমানদের সাথে যুদ্ধের গুরুত্ব বিবেচনা করেই এবার রসুল (দঃ) সরাসরি খোলাখুলিভাবে তাঁর ৩০ হাজার সৈন্যকে সিরিয়াভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেন। সিরিয়ার পথে তাবুক নামক স্থানে পৌঁছে মুসলমানগণ দেখলেন যে, রোমান সম্রাট তার মিত্রবাহিনীসহ সকল সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন এবং এখানে যুদ্ধ করার মতো প্রতিপক্ষ কেউ নেই। উল্লেখ্য ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনায় এমন ধারণা দিয়ে থাকেন যে, রোম সম্রাট কখনো আরব সীমান্তে কোনো সৈন্য মোতায়েন করেননি, তা সত্য নয়। আসল ঘটনা ছিল, রোমান সৈন্য ও তাদের মিত্রবাহিনী আক্রমণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়ার আগেই মুসলমাগণকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত দেখে তারা পিছুটান হতে বাধ্য হয়েছিল। তারা জানেন ‘মুতা’ যুদ্ধে মাত্র ৩ হাজার মুসলমানদের হাতে শুরহাবিলের ১ লক্ষ সৈন্যের কি শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল, আর এখানে ৩০ হাজার সৈন্য, তাও স্বয়ং রসুল (দঃ) সেনাপতির দায়িত্বে। যুদ্ধের প্রয়োজন হলো না, নবীজি (দঃ) সিরিয়ার দিকে আর অগ্রসর না হয়ে তাবুকেই ২০ দিনের জন্য থেমে গেলেন। তাবুকে অবস্থানকালে নবীজি (দঃ) ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নেয়ার জন্যে আরব ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন গোত্রের অধিবাসীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ফলস্বরূপ যে সকল ছোট ছোট প্রাদেশিক এলাকা রোম সম্রাটের অধীনস্ত ছিল তাদের অনেকেই ইসলামি রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে মদিনায় কর পাঠাতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যায়। তাবুক অভিযানের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরব বিশ্বের সকল কাফের, বিশেষ করে মদিনার মুনাফিক যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আবার ইসলাম ত্যাগ করেছিল এবং নিজস্ব আলাদা মসজিদ তৈরি করে, ইসলামের অনিষ্ট সাধনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের পুনর্গঠিত হওয়ার সকল আশা নিঃশেষ হয়ে যায়। আর এভাবে ইসলাম রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জগতে আল্লাহর রসুল (দঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন অর্থাৎ বিশ্বে মুসলমানদের জন্যে সুনির্দিষ্ট ইসলামি রাষ্ট্র (দারুল ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করা, তাতে পুরোপুরি সফলকাম হন।

এখন যেহেতু সমস্ত আরবের প্রশাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে এসে গেছে, আর ইসলামের শত্রুদের বিদ্রোহ করার সমূহ শক্তি ধ্বংস করা হয়ে গেছে, সেহেতু

সময় এসেছে, রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণ ইসলামি রূপ দিতে নতুন আইন ঘোষণা করার। যে সকল নতুন আইন ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুন নিয়ে সুরা তাওবাহতে আলোচনা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে : ১-৩ আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে কাফের মুশরিকদের সাথে সকল প্রকার সন্ধি বা চুক্তি হতে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (দঃ) মুক্ত হয়ে গেলেন। ৪ মাস বিরতির পর কাফেরদের সাথে মুসলমানদের সকল সন্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কাফেরদের পুরনো জীবন-পদ্ধতির শেকড় চিরদিনের জন্যে উপড়ে ফেলতে, এ ঘোষণার প্রয়োজন ছিল, যাতে আরবকে ইসলামের কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তোলতে কাফেরগণ ভবিষ্যতে কোন দিন বাঁধার সৃষ্টি করতে না পারে। ১২-১৮ আয়াতের মাধ্যমে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, কাবা ঘরের ওপর কাফেরদের কোন অভিভাবকত্ব থাকতে পারে না, কাবা ঘর শুধু মুসলমানদের হাতে থাকবে। মুশরিকদেরকে পবিত্র ঘরের নিকটে আসতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তাদের পুরানো সকল বিশ্বাস প্রথা-পদ্ধতি ও কুসংস্কারের চির-বিলুপ্তি ঘটে। আরবের বাহিরেও ইসলামের প্রভাব বিস্তারে মুসলমানগণকে অস্ত্রের মাধ্যমে অমুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করে স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি স্বরূপ অমুসলিমদেরকে কর প্রদানে বাধ্য করতে ২৯নং আয়াতে উম্ভসাহিত করা হয়েছে।

এবার মুনাফিকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। যেহেতু মুনাফিকদের সমর্থনে বাহির থেকে কোনো সাহায্য আসার আর ভয় নেই, সেহেতু এখন থেকে তাদেরকে প্রকাশ্যে কাফের বলে গণ্য করার জন্যে মুসলমানগণকে ৭৩-৭৪ নম্বর আয়াতে প্রেরণা দেয়া হয়েছে। দুর্বলচিত্তের মুসলমানদেরকে, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেছিল, তাদেরকে অন্তরের সকল সংসয়-সন্দেহ দূর করে, সারা পৃথিবীর অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্যে নিজেদেরকে মানসিকভাবে গড়ে তোলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ৮১ থেকে ৯৬ আয়াতগুলোতে। আর পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, কেউ যদি পুনরায় তাদের মতো ভবিষ্যতে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে, তাদের জীবন, অর্থ-সম্পদ, সময় ও শক্তি দিয়ে জেহাদ করতে বিন্দুমাত্র অবহেলা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাদেরকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে না।”

মৌলানা মওদুদি কর্তৃক বর্ণীত উপরোক্ত সুরা দুটো সুরা আনফাল ও তাওবাহ’র পটভূমি বা শানে-নুজুলের ওপর কোনো মন্তব্য না করে দেখা যাক কোরানে সুরা আত-তাওবাহতে কি বলা হয়েছে, তবে এখানেও বলে রাখি সবগুলো আয়াত এখানে উপস্থাপন করা হবে না, বরং প্রবন্ধের পরিসর যথাসম্ভব সীমিত রাখার

স্বার্থে এবং পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আয়াত ধারাবাহিকভাবে এখানে উপস্থাপন করা হলো :

সুরা আত-তাওবাহ-

১. "আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের তরফ থেকে অব্যাহতি ঘোষণা করা হলো সেই সকল মুশরিকদের প্রতি যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে।"

হঠাম্ভ করে আউজুবিল্লাহ নেই বিসমিল্লাহ নেই গরম গরম রেড ওয়ার্নিং! কিসের চুক্তি? সারা আরব বিশ্বে সন্ত্রাসের প্রলয় ঘটিয়ে, নিরপরাধ মানুষকে ঘর-ছাড়া করে, অবাধে নারী-পুরুষ জবাই করে, অগণিত শিশু হত্যা করে, ঘর-বাড়ি, গাছ-বৃক্ষ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করে, ন্যূনতম মানবিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে, এখন বুঝি মনে পড়লো হোদাইবিয়ায় সন্ধির কথা? হোদাইবিয়ায় সন্ধি ছিল মক্কা আক্রমণের পূর্ব-পরিকল্পিত নীল-নক্সা। এই আয়াতটি মক্কা আক্রমণ করার আগে উচ্চারণ করলে মানাতো ভাল।

২. "সুতরাং চার মাস স্বাধীনভাবে চলাফেরা করো। আর মনে রেখো, তোমরা আল্লাহর হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।"

আয়াতটি এরকম হওয়া উচিম্ভ ছিল-'আর মনে রেখো, তোমরা আমার হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। আমি নিশ্চয়ই কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকি'। কারণ কোরান তো আল্লাহর কথা!

৩. "আর এই মহান হজের দিনে মানুষদের প্রতি আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের কাছ থেকে দায়-মুক্ত আর তাঁর রসুলও। অবশ্য তোমরা যদি তওবা করো তা হবে তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। অন্যথায় জেনে রেখো আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের মুক্তি নেই। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সংবাদ দাও।"

'আল্লাহ মুশরিকদের কাছ থেকে দায়-মুক্ত'—এই কথার মানেটা কি? আল্লাহকে কি মানুষের মতো জবাবদিহি করতে হয়? কোনো দায়-বদ্ধতায় কি আল্লাহ কখনো দস্তখত করেছিলেন? হ্যাঁ, হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে (দশ বছরের শান্তি চুক্তি) দস্তখত করেছিলেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। হজরত আলির লেখা সেই সন্ধিপত্রে আল্লাহর নামটিও লেখা ছিল কিন্তু মুহাম্মদ বিনা দ্বিধায় নিজের হাতে নামটি মুছে ফেলে দিয়েছিলেন। আবু-তালিব, আবু-জেহেলতো কোনোদিন মাথানত করেননি, তারা তাদের আল্লাহর জন্যে জীবন দিয়ে গেছেন। আল্লাহর নামের হীন অপমান সহ্য করতে পারেননি হজরত ওমর। সেদিন ক্ষুব্ধ ওমর, হজরত আবুবকরকে প্রশ্ন করেছিলেন-উনি সত্যিই কি আল্লাহর নবী? দ্রষ্টব্য - 'Noble Life of the Prophet' (Dr. 'Ali Muhammad As-Sallaabee ১৫৩৪পৃষ্ঠা)

৫. "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে, মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদেরকে পাও, তাদেরকে বন্দী করো আর ঘেরাও করো চতুর্দিক থেকে। আর ওঁত পেতে বসে থেকো প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ পড়ে এবং যাকাত (কর) আদায় করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

কে বলে ইসলামে জবরদস্তি নেই??কোন্ মূর্খ দাবি করে ইসলাম অস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে কেউ কি মুসলমান থাকতে পারে? উপরের আয়াত অনুযায়ী মুসলমান না হয়ে অমুসলিম কেউ মুসলিম দেশে বাস করার কি কোনো পথ খোলা আছে?

৬. "আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে এবং তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এ জন্যে যে এদের কোন জ্ঞান নেই।"

কল্পনা করা যায় দুষ্ট রাজনীতি একজন দরিদ্র, অশিক্ষিত, পিতৃহীন, মাতৃহীন, আশ্রয়হীন মানুষকে কেমন আত্মম্ভরী করে তোলে? মানবিক জ্ঞান কতটুকু নীচে নামলে একজন মানুষ বলতে পারে-'আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দেবে এ জন্যে যে তাদের কোনো জ্ঞান নেই'। 'তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে'। আর যদি সে মুহাম্মদের আল্লাহ ছাড়া তার নিজের আল্লাহর কালাম শুনে, তাহলে? তাহলে তার জন্যে তো ওঁত্ত পাতানোই আছে, তাই না?

৭. "মুশরিকদের (অমুসলিম) সাথে কিরূপে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের চুক্তি বলবত্ত থাকবে, তবে তাদের ছাড়া যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে মসজিদুল-হারামের নিকটে? সুতরাং যতক্ষণ তারা তোমাদের প্রতি সরল থাকে তোমরাও ততক্ষণ তাদের প্রতি সরল থেকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।"

আল্লাহ যদি জানেন ওদের সাথে চুক্তি বলবত্ত থাকবে না, তাহলে চুক্তিতে সই করলেন কেন? মানুষ চুক্তি ভঙ্গ করলো, তাই আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলও মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে চুক্তি ভঙ্গ করলেন। মক্কা আক্রমণ করলেন, তারপর আরও কয়েকটি যুদ্ধে বেশকিছু এলাকা দখল করলেন, প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করলেন। মানুষ সরল হলে আল্লাহ ও সরল, মানুষ যুদ্ধ করলে আল্লাহ ও মানুষের সাথে যুদ্ধ করেন। মানুষ ঠাট্টা করলে, মশকরা করলে আল্লাহও ঠাট্টা মশকরা করেন, মানুষ মতলব-পরিকল্পনা করলে আল্লাহও মতলব-পরিকল্পনা করেন। এ আল্লাহ তো জীবন্ত এক মানুষ ছাড়া আর কিছু হতে পারেন না!

৮. "কেমন করে? (তাদের সাথে চুক্তি সম্ভব) তারা তো তোমাদের ওপর জয়ী হলে তাদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তার বা চুক্তির মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই ফাছিক (দুষ্কৃতিকারী)।"

এই যে কথায় কথায় তারা মুশরিক, ফাছিক, কাফের, মুনাফিক বলা হচ্ছে এগুলো মুসলমানদের মনে অমুসলিমদের প্রতি চিরদিন ক্ষোভ, ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্যে নয় কি? কোরান কি গালি শিক্ষার বই?

১২. "আর যদি তারা চুক্তি (শপথ) ভঙ্গ করে আর তোমাদের ধর্ম নিয়ে বিদ্রুপ করে তাহলে কাফের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো, এদের শপথের কোনো মূল্য নেই যে তারা বিরত থাকবে (দুষ্কর্ম করা থেকে)।"

তাদের অন্তর সম্বন্ধে এতো জ্ঞান থাকা সত্বেও আল্লাহ 'যদি' শব্দ ব্যবহার করলেন? পরধর্ম নিয়ে বিদ্রুপ করা মুহাম্মদের কোরান ছাড়া আর কোনো ধর্মগ্রন্থে আছে?

১৩. "তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসুলকে বহিস্কারের সংকল্প করেছিল? তারাই আগে তোমাদেরকে আক্রমণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ তোমাদের অধিকতর ভয়ের যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও।"

মাটির মানুষের কাছে আকাশের প্রতাপশালী আল্লাহর (না মুহাম্মদের?) কেমন করুণ মিনতি। বদর থেকে যুদ্ধ করে করে আর্মি ফেরেস্তারা কি মরে মরে সাফ হয়ে গেলেন, না কি সকলেই পেনশনে চলে গিয়েছিলেন?

১৬. "তোমরা কি মনে করো তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন, তোমরা কে যুদ্ধ করেছো এবং কে আল্লাহ ও তার রসুল ও মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছো? তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিবহাল।"

কে যুদ্ধে গিয়েছিল আর কে যায় নাই তা জানার জন্যে কিছুটা সময় লাগবে বৈকি। তবে এরা ভালোভাবেই জেনে গেছে মুহাম্মদের পদতলে মাথা নোয়ানো ছাড়া তাদের আর কোনো গতি নেই।

১৭. "মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ দেখাশুনা করার তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরির সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সকল কাজ (আমল) ব্যর্থ হবে এবং তারা চিরদিন আগুনের ভেতর বসবাস করবে।"

১৮. "নিশ্চয়ই তারাই আল্লাহর মসজিদ দেখাশুনা করবে যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে আর পরকালেও আর নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে, আর

আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায় এরা হেদায়তপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”

‘অতএব আশা করা যায় এরা হেদায়তপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’—আল্লাহরও মানুষের মতো আশা-নিরাশা আছে? কথাটা বোধহয় আল্লাহর নয় বরং মুহাম্মদের?

১৯. “তোমারা কি হাজিদেরকে পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম রক্ষণাবেক্ষণকে সেই লোকের সমান মনে করো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর ও পরকালে, আর আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে? এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালিমদের হেদায়ত করেন না।”

মুহাম্মদ ভুলে গেছেন কোরানের কথাগুলো হওয়ার কথা সরাসরি আল্লাহর, তিনি মাধ্যমমাত্র! কিন্তু বাক্যগুলো স্পষ্টই প্রমাণ করে বক্তা আল্লাহ নয় বরং স্বয়ং মুহাম্মদ। আল্লাহর কাছে সুফিবাদের কোনো মূল্য নেই; আছে সন্ত্রাসের অপরিসীম পুরস্কার।

২০. “যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং নিজের জীবন ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আর তারাই সফলকাম।”

জান আর মাল দিলে মর্যাদা ছাড়া আর কি কি পাওয়া যাবে?

২১. “তাদের আল্লাহ তাদেরকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন-স্বীয় দয়া ও সন্তোষের আর বেহেস্তের, সেখানে আছে তাদের জন্যে স্থায়ী শান্তি।”

মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহর ওপর ঈমান আনার পর আর কি করতে হয়?

২৩. “হে ঈমানদারগণ তোমরা তোমাদের স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করোনা, যদি তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসকে ভালোবাসে। আর তোমাদের যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।”

শুধু জন্মদাতা পিতা আর সহোদর ভাই ত্যাগ করলেই হবে?

২৪. “বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো, তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ করো, আল্লাহ ও তার রসুল ও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করো, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেকদলকে হেদায়ত করেন না।”

সাধে কি আর মায়ের মমতা, বাবার আদর, সন্তানের মায়া, বোনের স্নেহ স্ত্রীর ভালোবাসাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে জেহাদিরা বোমা হাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়?

২৫. “আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করেছেন এবং হোনাইনের যুদ্ধেও যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল এবং তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি, পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গিয়েছিলে।”

“আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করেছেন’ কথাটা যদি আল্লাহর হয় তাহলে এভাবে হওয়া উচিৎ ছিল- “আমি তোমাদেরকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করেছি’। আশ্চর্য! সাহাবিগণ বেহেস্তের দরজা থেকে পালিয়ে গেলেন?

২৬. “তারপর আল্লাহ নাজিল করেন সান্ত্বনা তার রসুল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন এক সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের, আর এটি হলো তাদের কর্মফল।”

এ সবতো উপস্থিত জনতার সামনে মুহাম্মদের দেয়া বক্তৃতাই মনে হয়। একজন মুমিন সমান দশজন কাফের নয়? আগের সুরা আনফালে তো তাই বলা হল? এতো সৈনিক থাকা সত্ত্বেও আকাশ থেকে ফেরেস্তা আর্মি নামাতে হলো? শুধু ফেরেস্তা আর্মি দিয়ে যুদ্ধ হয় না?

২৮. “হে ঈমানদারগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পরে যেন তারা পবিত্র মসজিদের নিকটে না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশঙ্কা করো তাহলে আল্লাহ চাইলে ভবিষ্যতে নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।”

স্পষ্টই মুহাম্মদের ভাষন। ‘আল্লাহ চাইলে ভবিষ্যতে নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন’—এটা আল্লাহর কথা হতে পারে না।

২৯. “তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কিতাবের (তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল কিতাব অনুসারী) ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আর নিষেধ করে না যা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল নিষেধ করেছেন এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না করজোড়ে জিজিয়া (কর) প্রদান করেছে ও আনুগত্য মেনে নেয়।”

তাদের যেহেতু কেতাব আছে সুতরাং তাদের আল্লাহ আছেন, নবী আছেন, আখেরাতও আছে। হঠাৎ করে তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদের নতুন ধর্মকে সত্যধর্ম বলে গ্রহণ করবে কেন? করজোড়ে কর প্রদান করে আনুগত্য মেনে নেয়ার সাথে ধর্মের সম্পর্কটা কি?

৩০. “ইহুদিরা বলে উজায়র আল্লাহর পুত্র আর খ্রিষ্টানরা বলে ঈসা আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মতো কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, তারা কেমন সত্য থেকে বিমুখ হয়।”

আবারও পর-ধর্মের সমালোচনা-বিদ্রোপ করা? আল্লাহ কি অন্য কোনো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন-'আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন' নাকি এর আড়ালে মুহাম্মদ লুকানো?

৩৩. "তিনিই সেইজন যিনি আপন রসুলকে পাঠিয়েছেন হেদায়ত ও সত্যধর্ম দিয়ে, যেন এই ধর্মকে সকল ধর্মের ওপরে প্রধান্য দিতে পারেন। যদিও মুশরিকগণ তা অপ্রীতিকর মনে করে।"

অন্য ধর্মের ওপর নিজের ধর্মের প্রাধান্য বিস্তার করা তো সাম্প্রদায়িকতা!

৩৮. "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহর পথে তোমাদেরকে বের হবার জন্যে বলা হয়, তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধরো। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আখেরাতের তুলনায় খুবই অল্প।"

কোথাকার বাক্য কোথায় এনে বসানো হয়েছে; বাক্যটি এই সুরার প্রথমে থাকার কথা। আর কতো যুদ্ধ? মানুষ একটু অব্যহতি চায়।

৩৯. "যদি তোমরা বের না হও, আল্লাহ তোমাদেরকে ভীষণ শাস্তি দেবেন আর অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"

মুহাম্মদ ভুলে গেছেন বাক্যের প্রথমে 'কুল' (বলো) শব্দ না বসালে কথা যে তার নিজের হয়ে যাবে!

৪০. "যদি তোমরা তাঁকে (রসুলকে) সাহায্য না করো তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেরেরা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন বিষণ্ণ হয়ো না, আল্লাহ আপনাদের সাথে আছে। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রতি সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন এক বাহিনী পাঠালেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। বস্তুত আল্লাহ কাফেরদের মাথা নত করে দিলেন, আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"

এই বাক্যে বক্তা আল্লাহ না মুহাম্মদ না জিব্রাইল? এঁদের হলোটা কি? দুর্বল আল্লাহ মানুষের কাছে সাহায্যের জন্যে এতো কাকুতি মিনতি করছেন, লোভ-লালসা, ভয়-ভীতিও দেখাচ্ছেন , সর্বোপরি তারা জানেন, তারা আছেন যতো, আকাশ থেকে আসবেন ততো এবং মহা পরাক্রমশালী স্বয়ং আল্লাহও তাদের পক্ষে, তবুও যেন ওরা নড়তে চায় না। তাদের কি হুনাইনের সেই ভয়ানক জঙ্গলের কথা মনে পড়েছে, না কি রোমানদের ভয়ে তারা ভীত! আর আল্লাহই বা কষ্ট করে বারবার সাদা বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে ধরাতলে নেমে আসেন কেন? কিছু সময়ের জন্যে সুপারম্যান আজরাইলকে পাঠিয়ে দিলেই তো হতো।

৪১. “তোমরা বের হয়ে পড়ো অল্প অথবা প্রচুর সরঞ্জাম নিয়ে (যা কিছু আছে তাই নিয়ে) আর জেহাদ করো আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের প্রাণ ও মাল দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে খুবই উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পারো।”

মদিনার নতুন মুসলমানদের বুদ্ধিসুদ্ধি মক্কার জেহাদি ভাইদের তুলনায় একটু কমই। এমনিতেই যুদ্ধে যেতে চায় না আর গেলেও যুদ্ধে পাওয়া মালের ওপর ভাগ বসাতে চায়। এরা তখন বুঝবে যখন মুনাফিকের খাতায় নাম উঠবে!

৪২. “যদি (এ যুদ্ধে) আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো আর যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যেতো, কিন্তু দুর্গম পথ তাদের কাছে দীর্ঘ মনে হলো। তারা তোমার কাছে কসম খেয়ে বলবে—আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করেছে আর আল্লাহ জানেন এরা মিথ্যেবাদী।”

মহাশক্তিশালী রোম সম্রাটের সাথে যুদ্ধ। নগদ মালের সম্ভাবনাও নেই। খামোখা জানের ওপর রিস্ক নিতে কি সকলে চায়?

৪৩. (হে নবী) “আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদেরকে অব্যহতি দিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেতো কে সত্য বলছে আর জেনে নিতেন কে মিথ্যেবাদী?”

‘আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদেরকে অব্যহতি দিলেন’—কে বলছেন কথাটা? মুহাম্মদের কোনো গুপ্তচর, কোনো সাহাবি, নাকি স্বয়ং আল্লাহ? ক্ষমা তাকেই করা হয় যে অপরাধ করে। মুহাম্মদ কি অপরাধী!

৬৬. “অজুহাত দেখিও না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছো ঈমান আনার পরও। তোমাদের কিছু লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব কারণ তারা ছিল অপরাধী।”

কোন দুঃখে ঈমান আনার পরও মুসলমানগণ কাফের হয়ে গেল? মক্কার কোরায়েশদের ইসলামি আচরণ, মুহাম্মদ ও তার ইসলামের রাজনৈতিক মুখোশপরা সন্ত্রাসী চেহারা চিনতে ভুল করেছিল?

৭৯. “যারা বিদ্রুপ করে সেই সকল মুসলমানদের প্রতি যারা মুক্ত মনে দান খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই নিজের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ ছাড়া। অতঃপর তারা ওদের প্রতি ঠাট্টা করে, আল্লাহও তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।”

যে আল্লাহ বারবার বলেন তার কাছে আছে অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার, মানুষের সকল ধন তারই দেয়া, সেই আল্লাহ যখন মানুষের কাছে কর্জ চান, সাহায্য চান, ভিক্ষে চান, বিজনেস করেন, মানুষ একটু কনফিউজড হবেই। মদিনার মানুষ মুসলমান হলো কিন্তু তাদের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ ছাড়া কিছুই নেই, আর মক্কার শরণার্থীদের

কিছুই ছিল না অথচ এখন দুই হাতে দান-খয়রাত করতে পারে, বিষয়টায় ভাববার হেতু আছে। যাক আল্লাহও তাদের প্রতি ঠাট্টা করে নিয়েছেন। সমানে সমান হয়ে গেছে আর দুঃখ নেই!

৮০. "তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো, যদি তাদের জন্যে সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবু আল্লাহ ওদের ক্ষমা করবেন না। তা এ জন্যে যে তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলকে অস্বীকার করেছে, আর আল্লাহ নাফরমানদেরকে পথ দেখান না।"

আল্লাহর রাগ উঠে গেছে সুতরাং মুহাম্মদ ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তা কবুল হবে না। তবে যদি একাত্তরবার করেন, ভেবে দেখবেন কি মহান আল্লাহতায়ালা!

৮১. "পেছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দবোধ করেছে, আর তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে এই গরমের দিনে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও জাহান্নামের আগুন অনেক বেশি উত্তপ্ত যদি তারা বুঝতে পারতো।"

৮২. অতএব তারা সামান্য হেসে নিক। তাদের কৃতকর্মের বদলে অনেক বেশি কাঁদবে।

তারা হাসলো আর আল্লাহ হাসলেন না, এ কেমন কথা?

৮৩. "কাজেই আল্লাহ যদি তোমাকে ফিরিয়ে আনেন (তাবুক থেকে) তাদের কোন দলের মাঝে আর তারা তোমার সাথে বেরুবার অনুমতি চায় তুমি বলো- তোমরা কোনো সময়ই আর আমার সাথে যেতে পারবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোনো শত্র"র সাথে যুদ্ধ করবে না। নিশ্চয়ই তোমরা তো প্রথমবারে পেছনে থেকেছ। সুতরাং পেছনে থাকার দলেই থেকো।"

'আল্লাহ যদি তোমাকে ফিরিয়ে আনেন'-কথাটা যেন কোনো মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত মনে হলো।

৯৪. "তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তারা তোমার কাছে এসে ছলনা করবে, তুমি বলো ছলনা করো না আমি কখনো তোমাদের কথা শুনবো না, আল্লাহ আমাকে তোমাদের সম্বন্ধে জানিয়ে দিয়েছেন। আর এখন থেকে আল্লাহই তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন আর তার রসুলও। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে সেই জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিষয়ে অবগত সত্তার কাছে। তিনিই তোমাদের বলে দেবেন তোমরা যা করেছিলে।"

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর বলা হচ্ছে 'তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে' এই সাধারণ শুভংকরের ফাঁকিটাও বোকার স্বর্গলোভী মানুষগুলো ধরতে

পারলো না। আজ যদি কোনো জ্যোতিষী ভবিষ্যত্ত বাণী লেখে এভাবে, “বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করা হবে, রাজাকাররা সংসদে যাবে”—এমন জ্যোতিষীকে আপাদমস্তক পাগল ছাড়া আর কি বলা যায়?
৯৫. “যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে আসবে, তারা আল্লাহর কসম খাবে, যেন তুমি তাদের উপেক্ষা করো, সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা করো, নিঃসন্দেহে এরা নাপাক এবং এদের গন্তব্যস্থল হলো জাহান্নাম।”
হাটকোর্ট থেকে জামিন পেলে কি হবে, সুপ্রিম কোর্টে আপিল হয়ে গেছে, ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা মোটেই নেই! ‘ভবিষ্যতকাল’ দিয়ে বলা বাক্যগুলো, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর প্রকাশ করা হচ্ছে কেন?
১০২. “কোন কোন লোক আছে যারা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তারা এক ভাল কাজের সাথে অপর মন্দ কাজ মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।”
‘আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন’—কথাটা কি আল্লাহর?
১০৩. “তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা (দান) গ্রহণ করো যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারো। আর তুমি তাদের জন্যে দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের জন্যে সান্ত্বনা স্বরূপ। আসলে আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।”
সর্বনাশ, বলেন কি! এরই মধ্যে কালো টাকা সাদা হয়ে গেলো? তবুও শুকরিয়া টাকার গন্ধ পেয়ে আল্লাহ যে মাইন্ড চেইঞ্জ করেছেন। এবার তো আল্লাহর গুস্বা কিছুটা শীতল হয়েছে। তা দোয়া কতবার করতে হবে? ৭০ বার না ৭১ বার?
১০৭. “যারা জিদের বশে মসজিদ নির্মাণ করেছে, তাদের ঘাটি স্বরূপ, কুফরির তাড়নায়, মুমিনদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, পূর্ব থেকে যুদ্ধ করে আসছে আল্লাহ ও তার রসুলের সাথে, তারা কসম খেয়ে বলবে-আমরা যা করেছি মঙ্গলের জন্যে করেছি। অথচ আল্লাহ সাক্ষী যে তারা সবাই মিথ্যুক।”
কোর্ট নেই, কাছারি নেই, সাক্ষী হাজির। আবার কেউ সাক্ষীকে দেখেও না।
১১১. “আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন এই মূল্যে যে তাদের জন্যে রয়েছে বেহেস্ত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায় অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল, কোরানে তিনি এ সত্য প্রতিশ্র“তিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে নিজ ওয়াদাতে সত্যনিষ্ট আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করো তোমাদের সওদার জন্যে যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটি হচ্ছে মহাসাফল্য।”

মুহাম্মদ পুরোপুরি ভুলে গেছেন তিনি যে হাদিস নয় কোরান লিখছেন। তা জানমাল নগদ, দৃশ্যমান ও বাস্তব কিন্তু বেহেস্ত বাকি, অদৃশ্য ও কল্পনা, এ কেমন বিজনেস?

১২৩. "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক, আর জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকিনদের সাথে আছেন।"

এ আয়াত অনুসরণ করেই, সারা পৃথিবী জুড়ে ঈমানদারগণ (অবশ্য যারা প্রকৃত ঈমানদার) কাফের নিধনে লিপ্ত আছেন এবং এ যুদ্ধ অনাদিকাল চলবে। এ কোরানই শিক্ষা দেয়া হয় ইসলামি সেন্টার, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপরের দুটি সুরার আয়াতগুলি পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোরান হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা-সন্ত্রাসের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল, নট এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ।

চলবে-